দেশের রাজনীতি ও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

এবিএম মূসা

পর পর দু'টি আলোচনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তব্য দেয়ার সুযোগ পেয়েছি। দু'টি আলোচনা সভার বিষয় দুই হলেও সারবস্তু এক। তবে আয়োজকদের বিভিন্নতা রয়েছে। একটির আয়োজক ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অপরটির একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান। প্রথমটিতে মূল বিষয় ছিল পরীক্ষায় দুর্নীতি, দ্বিতীয়টিতে আলোচনার বিষয় ছিল শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস। একটিতে সরকারী মহলের চিন্তা-ভাবনা ও নীতির প্রতিফলন ঘটেছে, অন্যটিতে বৃহত্তর ছাত্র সমাজের উদ্বেগ ও আশঙ্কা। মূলত দু'টি বিষয়ের সঙ্গেই সন্ত্রাস ও দুর্নীতি জড়িত রয়েছে। পরীক্ষায় নকলবাজি, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের আশ্রয় ও প্রশ্রয় ছাড়া হতে পারেনা, বিশেষ করে সন্ত্রাস না করে নকলবাজি করা যায় না। অপরদিকে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। বলা যায় একটির কারণে অন্যটির বিস্তার ঘটে। মতপার্থক্য শুধু একটি ক্ষেত্রেই হতে পারে–সন্ত্রাসের কারণে দুর্নীতি হয় অথবা দুর্নীতি করার জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়া হয়। অপর ক্ষেত্রে সব বিষয়েরই মিল রয়েছে, তা হচ্ছে রাজনীতির ভূমিকা অথবা রাজনৈতিক পটভূমি। এখন নকলবাজি, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি-- তিনটিই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। এই রাজনীতি শুধু শিক্ষাঙ্গনে নয়, দেশের সামগ্রিক রাজনীতির প্রতিফলন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেমিনারে পরীক্ষায় নকলের ব্যাপক বিস্তারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক আলোচনার সময়ে নকলবাজি বন্ধে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করেছেন। সে সবই হচ্ছে প্রধানত প্রশাসনিক পদক্ষেপ, কিন্তু অংশগ্রহণকারী সবাইয়ের বক্তব্যে রাজনীতিবিদদের ভূমিকাও প্রাধান্য পেয়েছে। যেহেতু সাদেক মূলত রাজনীতিবিদ নন, তাই সেদিকটি বুঝতে পারলেও সমাধান দিতে পারবেন না। বরং কোন কোন সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে গেলে রাজনীতিবিদদের কোপানলে পড়বেন। রাজনৈতিক নেতা ও পাতি নেতাদের কারণে অন্তত একটি পদক্ষেপ তিনি নিতে পারবেন না সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। তিনি নকলবাজির আড়তগুলোত বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করতে পারবেন না। যেখানে পরীক্ষা কেন্দ্রে ভাংচুরে নকলবাজদের স্থানীয় রাজনীতিকেরা উস্কানি দেন সেখানে তিনি শত সদিচ্ছা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নিতে পারবেন না। চৌদ্দগ্রাম ও টাঙ্গাইল এই বছর যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে অন্য জায়গায় ঘটলেও তাঁর কিছুই করার থাকবে না। তিনি প্রশ্নপত্র ফাঁস করার বন্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন, যারা ফাঁস করে তাদের শাস্তি দিতে পারবেন, কিন্তু এর মূলে পৌঁছাতে পারবেন বলে মনে হয় না। তবুও তাঁর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদিচ্ছার প্রশংসা করি। যেসব ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন তা কতদূর বাস্তবায়িত করতে পারবেন তাই দেখার জন্য অপেক্ষা করব। সেহেতু তাঁদের প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলো বহুল আলোচিত ও সর্বজনবিদিত সেহেতু পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনার আয়োজন করেছিল সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। ঢাকা বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রভাব সীমিত। সুতরাং তাঁরা যাই বলুন তার প্রভাব কতখানি শিক্ষাঙ্গনে বা অধিকর্তাদের ওপর পড়বে সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। তবুও তাঁরা করেছে বা করতে পেরেছে, এ নিয়ে কথা বলতে পেরেছে। কারণ সাধারণভাবে মনে করা হয় এসব ছোটখাটো ছাত্র প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাস ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নয়। কারণ তাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে মুরব্বীরা তা উৎসাহিত করে না।। যদি বৃহৎ ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলি সন্ত্রাস ও দুর্নীতি বিষয়ে একইভাবে উদ্বিগ্ন হতো তা হলে এ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হতো না। সন্ত্রাস ও দুর্নীতি শিক্ষাঙ্গনে ঠাঁই পেত না। সেদিনের আলোচনায় আমি এই বক্তব্যটির ওপর প্রাধান্য দিয়েছি, জানি না কতটুকু প্রকাশ করতে পেরেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নিয়ে বিভিন্ন সময়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মাননীয় বিরোধীদলীয় নেত্রী সন্ত্রাস নিরোধের কথা বলেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের দু'জনের নিয়ন্ত্রণাধীন ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলিরই এ ব্যাপারে মুখর হওয়া উচিত ছিল। নেত্রীর কথায় ও তাঁর মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য জান দেয়ার কথা বলতে পারে, কিন্তু এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তাই আমি বলেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠন অকার্যকর করা হবে ঘোষণা না দিয়ে তাদের কেউ যেন সন্ত্রাস করবে না এই নিশ্চয়তা বা হুঁশিয়ারী দিতে হবে। অমুক জেলা তমুক জেলার রাজনীতি কারা করছে তার খোঁজ নিন। বিরোধীদলীয় নেত্রী তাঁর ছাত্র সংগঠনকে অস্ত্র ফেলে দিতে বলতে পারেন। অবশ্য তা করতে হলে দু'জনকেই প্রথমে স্বীকার করে নিতে হবে তাঁর সংগঠনের নেতৃত্বে সন্ত্রাসী আছে। সেখানেই বোধ হয় সমস্যা। কারণ ছাত্র সন্ত্রাস ও দুর্নীতির সঙ্গে দেশের বৃহত্তর ও দলীয় রাজনীতি জড়িত রয়েছে। সে কারণে বর্তমানে সন্ত্রাস দমনের প্রশ্ন উঠলে অনেকেই ঢালাওভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা বলেন। তাঁরা ভুলে যান ছাত্র রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্ম দেয়নি, সন্ত্রাস বাইরে থেকেই আমদানি করা হয়েছে। সন্ত্রাসই ছাত্র রাজনীতিকে গ্রাস করছে। সেই রাহুগ্রাস থেকে মুক্তির কথা কেউ বলছেন না। অথবা বলা যায় বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণের জন্যই বাইরে থেকে রফতানি করা হয়েছে।

এমনটি আজকে ঘটেনি, সেই আদ্যিকালে পাকিস্তানী আমলেই এই কার্যধারার শুরু, বর্তমানে এসে তা ব্যাপক ও চরমরূপ লাভ করেছে। বাইরের রাজনীতি ছাত্র সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয় বা নিয়ন্ত্রণ করে অথবা পরিচালনা করে। তাই দেশের রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটলে ক্যাম্পাসগুলোর আবহাওয়া বা সামগ্রিক চিত্রে তার চেহারা ফুটে ওঠে। এ নিয়ে কোন এক সময়ে এক ছাত্রনেতাকে সত্যি কথাটি বলার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। নেতাটি বড়াই করে কোথাও বলছিল তার কারণেই নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার দলের প্রভাব বেড়েছে, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম এতই যখন সে শক্তিমান তা হলে তার দলটি যখন ক্ষমতার বাইরে ছিল তখন কেন তার প্রতিষ্ঠানটি এই কর্তৃত্ব খাটাতে পারেনি? দেশের ক্ষমতা দখলে এলেই কেন কোন বিশেষ ছাত্র প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে দখলদারী কায়েম করা সম্ভব হয়? দেশের রাজত্ব হাতে এলেই কেবল ক্যাম্পাস দখলদারী কেন?

এই প্রশ্নের সম্ভাব্য দু'টি উত্তর রয়েছে। এক. ক্ষমতার ব্যাকিং বা পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয় ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাসের মাধ্যমে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। দুই. রাজনীতিতে যেমন, তথাকথিত ছাত্র রাজনীতিতেও মিরপুরের খালেকদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই সংগঠনের হয়ে যারা দখলদারী বা কর্তৃত্ব কায়েম করে, তারাই জমানা পাল্টে গেলে অন্য দলের হয়ে কাজটি করে। একবার এই দলের মুখোস পরে, আবার অন্য দলের আশ্রয়ে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি করে। অর্থাৎ ব্যক্তিরা সব এক, কাজকর্মও একই ধরনের শুধু পরিচয় পাল্টায়। একারণেই ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, অথবা মাত্রা বেড়ে গেছে।

আমার কাছে যা রহস্যজনক মনে হয় তা হচ্ছে, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি কেন ছাত্র রাজনীতি অথবা ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এত মাথা ঘামায়, এত গুরুত্ব দেয়। কেউ মনে করে হল বা ক্যাম্পাস দখল করলেই ক্ষমতায় থাকা বা ক্ষমতায় ফিরে আসা যায়? এই দেশের সামগ্রিক রাজনীতি অতীতে ছাত্র সমাজ বা ছাত্র সংগঠনগুলি নিয়ন্ত্রণ করলেও এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই। এমনকি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে তথা ভোটাভুটির লড়াইয়ে ছাত্রদের এখন আর কোন প্রতিপত্তি নেই। রাজনৈতিক আন্দোলনও যে এখন আর ছাত্রনির্ভর নয় বর্তমানে বিরোধী দল তা উপলব্ধি করতে পেরেছে। তা হলে কেন বাইরে থেকে শিক্ষাঙ্গনে প্রভাব বিস্তারের জন্য সন্ত্রাসী পুষতে হবে? ঢাকা-চট্টগ্রাম বা জাহাঙ্গীরনগর কব্জায় আনলে দেশ বা ক্ষমতা দখলের রাস্তা খুলে যায় না, রাজনৈতিক দলগুলির এই বোধটুকু কেন জন্মায়নি তা বোধগম্য নয়।

অপরদিকে সন্ত্রাস করতে পারে বলেই ছাত্রদের একটি গোষ্ঠী দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ার সুযোগ পায়। অথবা দুর্নীতিবাজ বনে গেছে। তাই সেই ধারাটি অব্যাহত রাখার জন্য তাদের সন্ত্রাস করতে হয়। দেশে দুই সামরিক শাসক জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদ কতিপয় ছাত্রকে পয়সা চিনিয়েছিলেন। এর পিছনে দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। এক. তাঁরা জানতেন এ দেশে সকল প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ ক্যাম্পাস থেকে আসে, সেখানে যদি দুর্নীতির বীজ বপন করা যায়, আবহাওয়া কলুষিত করা যায় তবে ক্ষমতায় নিরুদ্বিগ্ন থাকা যাবে। চাঁদা আর টেন্ডার নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তাদের পিছনে লাগার সময় পাবে না। দেশের রাজনীতিবিদদের যে পন্থায় তাঁরা চরিত্রহীন বানিয়েছিলেন, আদর্শচ্যুত করেছিলেন, ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একই কৌশলই তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত দেশে রাজনীতিবিদদের সরকার যাঁরা যখনই গঠন করলেন তাঁরা সেই ধারাটির পরিবর্তন করেননি। কলুষিত শিক্ষাঙ্গন পরিচ্ছন্ন করার কোন চেষ্টাই তাঁরা করলেন না। আশ্চর্যজনকভাবে তাঁরা স্বৈরশাসকদের রীতি ও ভাবধারায় বিশ্বাস করে একই চিন্তা-ভাবনায় আচ্ছন্ন রইলেন।

তা হলে কী বলতে হবে যদিও দেশে গণতন্ত্র কায়েম হয়েছে শিক্ষাঙ্গণে সামরিক শাসকদের ভূতের ছায়াটি অপসারণ সম্ভব হয়নি? বৃহত্তর দেশীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে কি কোন পরিবর্তন আসেনি যার প্রভাবে ক্যাম্পাস বা শিক্ষাঙ্গনের রাজনীতি স্বৈরশাসকদের আমল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে? ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী রাজনীতি নিয়ে দুশ্চিন্তা করার আগে এই প্রশ্নটি নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। তা না হলে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টকে কেন একা সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষীণ আওয়াজ তুলতে হয়? আসলে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিবর্তন না এলে শিক্ষাঙ্গন যা হয়েছে তাই থাকবে। যেখান থেকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির প্রবাহ শিক্ষাঙ্গনে উপছে পড়েছে সেখানেই এর গতিপথ রুদ্ধ করতে হবে। সচেতন ছাত্র সমাজ একা তা পারবে না। তাদের কাজ অতি কঠিন, কিন্তু উদ্যোগ নিয়েছে, সীমিত শক্তি নিয়ে চেষ্টা করছে। এখন তাদের সাফল্য কামনা করে অন্যদেরও আর কিছু করা যায় কিনা তা ভাবতে হবে।